পুষ্টি

স্বাগত নন্দী

প্রতীচী ইনস্টিটিউট

pusti
পুষ্টি

প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১১

© প্রতীচী ইনস্টিটিউট

প্রকাশক
প্রতীচী ইনস্টিটিউট
প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট
২য় তল, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
ইই ৭/১, সেক্টর ২, সল্ট লেক, কলকাতা ৭০০০৯১
টেলিফ্যাক্স : ০৩৩ ২৩৩৪ ৪২২৯

হেড অফিস
প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট
এ ৭০৮ আনন্দলোক, ময়ূর বিহার ১, দিল্লী ১১০০৯১
টেলিফ্যক্স : ০১১ ২২৭৫২৩৭৫

শান্তিনিকেতন প্রজেক্ট অফিস
'সুজন', ডিয়ার পার্ক, শান্তিনিকেতন - ৭৩১২৩৫
টেলিফ্যাক্স : ০৩৪৬৩ ২৬১৫০৮

চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ইউ(CRY)-এর সহযোগিতায় প্রকাশিত

মুদ্রণ
এস এস প্রিন্ট
৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

মুখবন্ধ

মানবিক বিকাশের একটি প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে পুষ্টি। মানুষের কার্যক্ষমতা, মেধা, কলাকৌশলগত দক্ষতা, সুক্ষ্ম মানবিক গুণাবলী, ইত্যাদি ব্যাপারগুলি অনেকটাই নির্ভর করে মানুষের পুষ্টিগত নিশ্চয়তার উপর। এটা শুধু জন্মের পরেই নয়, জন্মাবার অনেকটা আগেই নির্ধারিত হয়ে যায়। মা বাবার পুষ্টির মাত্রাটি বেশ খানিকটা প্রভাবিত হয় তাঁদের মা-বাবাদের পুষ্টির উপর, বিশেষত মায়েদের পুষ্টির উপর। তার মানে এই নয় যে, যেহেতু অপুষ্টি একটি চলে আসা ব্যাপার, অতএব সেটা সেরকমই চলতে থাকবে। বরং উল্টোটা। বিকশিত দেশগুলির উদাহরণ থেকে আমরা দেখি মা ও শিশুদের পুষ্টির দিকটা নিশ্চিত করার যে প্রক্রিয়া সেই দেশগুলি নিয়েছিল তার সুফল হিসাবে তারা এখন এমন একটা জনসম্প্রদায় গড়ে তুলতে পেরেছে যা নানান মানবিক সত্তার দিক দিয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। নরওয়ে, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস থেকে নিয়ে কোরিয়া, জাপান পর্যন্ত পশ্চিম ও পূর্ব গোলার্ধের নানান দেশই এ ব্যাপারে বিরাট প্রগতি অর্জন করেছে। এই প্রগতির ছাপ পড়েছে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধূলা এবং অবশ্যই অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতাতেও। অর্থাৎ ঠিকমতো উদ্যোগ নিলে পুষ্টির সমস্যাটি যেমন দূর করা যায়, তেমনি এর সুবাদে দেশের অন্যান্য অনেক সমস্যারও সমাধান করা যায়।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ নানান অগ্রগতি করলেও পুষ্টির দিক দিয়ে এর প্রাপ্তিটি এখনও অবিশ্বাস্য রকমের খারাপ। এখানকার অপুষ্টির মাত্রা আফ্রিকার নিম্ন-সাহারা অঞ্চলের লাগাতার দূর্ভিক্ষ পীড়িত দেশগুলোর চেয়েও বেশি। এই নিম্নমাত্রার পিছনে গবেষকরা দেখিয়েছেন, সবচেয়ে বড় কারণ আমাদের সমাজ বিন্যাস, যেখানে জাতি, শ্রেণি, লিঙ্গ, ইত্যাদি বিভাজনগুলি দেশের মানুষকে নানান বঞ্চনার শিকার করে রেখেছে। কিন্তু একই সঙ্গে যদি পুষ্টির উপর নজর দেওয়া যায়, যেটা কেরালা বা তামিলনাড়ু করেছে, তাহলে এই বঞ্চনাগুলিকেও প্রশমিত করা যায়। পুষ্টি-সুনিশ্চিত মানুষ নিজেই নিজের বিকাশে একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে। তার যে মৌলিক সামর্থ্য সেটা গড়ে তুলতে পুষ্টি একটা স্তম্ভ হিসাবে কাজ করে।

এই নিশ্চয়তার জন্য শুধুমাত্র সরকারি কার্যক্রমের উপর নির্ভর করলেই চলে না। একদিকে এটা দেখতে হয় যাতে সরকারি প্রকল্পগুলি যথা— আই.সি.ডি.এস, স্বাস্থ্য কর্মসূচি, মিড ডে মিল, এন.আর.ই.জি.এ., ইত্যাদি ঠিকমতো রূপায়িত হয়। আবার অন্যদিকে পুষ্টি নিয়ে মানুষের মধ্যে যে বিভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে সেগুলাকে দূর করার জন্যও সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজন হয়, যে আন্দোলনটার নেতৃত্ব দিতে পারেন শিক্ষক, শিক্ষিকা, আই.সি.ডি.এস ও স্বাস্থ্যকর্মী এবং অন্যান্য সচেতন লোকেরা। পুষ্টি নিয়ে একটা ভুল ধারণা যেটা প্রায়ই দেখা যায় সেটা হল প্রচুর খাবার খেলেই পুষ্টি হয়। বাংলায় একটা কথা আছে, হৃষ্টপুষ্ট, যেটা সাধারণত একটু মোটাসোটাদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মোটা হওয়াটাও যে ক্ষতিকর এবং নানান প্যাকেটজাত খাবার এই ক্ষতির মাত্রা বাড়ায়, সেটা অনেক সময়ই আলোচিত হয় না। অন্যদিকে কম ওজন, কম উচ্চতা, রক্তাল্পতা ইত্যাদি অভাবগুলো ব্যাপক জনসাধারণ বিশেষত নারী ও শিশুদের মধ্যে প্রকট হলেও এটাকে যেন স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। এই অপুষ্টি প্রধানত খাদ্যাভাব থেকেই আসে, কিন্তু তার মধ্যে খাদ্যাভ্যাসও একটা বড় ভূমিকা পালন করে। সেই সঙ্গে পানীয় জল সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধিগুলি সম্পর্কে সচেতনতার ভূমিকাটিও খুব বড়। আবার, মেয়েদের কম খেতে 'শেখানো'র যে ঐতিহ্য আমাদের দেশে আছে সেটা শুধু মাতৃ অপুষ্টি নয়, শিশু অপুষ্টিরও প্রধান কারণ।

এই নানান দিকগুলি নিয়ে একটি আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য বর্তমান পুস্তিকটি। এটি লিখেছেন 'ক্রাই'-এর সঙ্গে মিলে বীরভূম জেলায় আমাদের একটি উদ্যোগের সংযোজক স্বাগত নন্দী। প্রতীচী ইনস্টিটিউটের পিয়া সেন, সুস্মিতা বন্দোপাধ্যায় ও অন্যান্যরাও কাজটিতে সাহায্য করছেন। প্রতীচী ইনস্টিটিউটের উপদেষ্টা দিলীপ ঘোষ পুষ্টির গুরুত্ব ও এ সম্পর্কিত কাজকর্মের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে নিরন্তর চিন্তা জুগিয়ে এসেছেন। শিক্ষা ও পুষ্টি নিয়ে কর্মরত ডাঃ সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় এই লেখার কাজে খুবই সাহায্য করেছেন। এ ছাড়াও অন্যান্য অনেকের কাছে আমরা ঋণী। ক্রাই এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বীরভূম জেলার প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা একটি গণ উদ্যোগের যে কাজ চালিয়ে আসছি সেই কাজটির অংশ হিসাবে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে একটি গণ আলোচনা গড়ে তুলতে চাই। জনসমাজের বিকাশের লক্ষে যাঁরা কাজ করছেন, পুস্তিকাটি তাঁদের সেই কাজে কিছুটা সাহায্য করবে এই আশায় আমরা এটা প্রকাশ করছি।

প্রতীচী ইনস্টিটিউট

শিশুর পুষ্টি ও দেশ

অর্থনীতিবিদদের মতে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা বা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দেশের সবেচেয়ে মূল্যবান সম্পদটিকে কাজে লাগানো। এটিই সে দেশের উন্নয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। আর যে কোনও দেশের অমূল্য সম্পদ হচ্ছে তার শিশুরা; তাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থ জীবন। সে জন্য প্রয়োজন শিশুর পুষ্টির উন্নতির দিকে যথাযথ যত্ন নেওয়া, যা পরবর্তীকালে সেই দেশের আয়ের বৃদ্ধিসূচক হয়ে দাঁড়াতে পারে। গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণে দেখা গেছে, উৎপাদন ক্ষমতা সরাসরি মানুষের শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। যে কারণে অপুষ্টির দরুণ মানুষের দৈহিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটলে তা দেশের উৎপাদন ক্ষমতার উপরও প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের কর্মক্ষমতা অপুষ্টির দরুণ হ্রাস পেলে দেশের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। উল্টোদিকে শিশু মৃত্যুর হার কম হলে, পুরনো রোগের চিকিৎসার খরচ কমলে, সদ্যোজাত শিশুদের প্রতি যথাযথ যত্ন নেওয়া হলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পেতে পারে। এবং তার থেকেও বড় কথা এই উন্নয়নের প্রতি নজর দেওয়া হলে উন্নয়নের যে ধারার সূচনা হবে তার সুফল কিন্তু পাবে আগামী প্রজন্ম। সার্বিক উন্নতি হবে দেশেরও।

দেখা গেছে শৈশবে অপুষ্টির কারণে শিশুর ১ শতাংশ কম উচ্চতা (প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায়) প্রায় ১.৪ শতাংশ উৎপাদন-শীলতা কমিয়ে দেয়। যা আসলে সেই মানুষটির ২-২.৪ শতাংশ আয় কমায়। সমীক্ষা বলছে, একটি শিশুকে কম ওজন নিয়ে জন্মানো আটকাতে পারলে কম

আয়ের দেশগুলিতে সাশ্রয় হতে পারে শিশু প্রতি প্রায় ২৯ হাজার টাকা।

আবার, শিশুর জ্ঞান বিকাশ ও বিদ্যালয় শিক্ষার উপরও শিশুর অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যের প্রভাব অপরিসীম, যা নিয়ন্ত্রণ করে দেশের সঠিক উৎপাদনশীলতারও। একটু খুলে বললে, শরীরিক কম পুষ্ট শিশুর বিদ্যালয়ে যেতে দেরি হয়। তার লেখাপড়া শুরু হতে দেরি হয়, পড়াশোনার অগ্রগতিও কম হয়। ফলে তার শিক্ষার উন্নতির হার কম হয় যা পরে সার্বিক শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাড়ায় এবং দেশের উন্নতিতেও সমস্যা সৃষ্টি করে।

সাধারণভাবে শরীরের বৃদ্ধি নির্ভর করে পুষ্টির ওপর। ফলে পুষ্টি না হলে শরীর স্বাভাবিক-ভাবে বাড়তে পারে না। যার থেকে কম ওজন, স্বাভাবিকের থেকে কম উচ্চতা, ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির মাত্রা বেশ উদ্বেগজনক। সাধারণত আমরা যে তথ্য পেয়ে থাকি তা ৬ বছর পর্যন্ত শিশুদের; প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে এই তথ্য সংগ্রহের একটা কাজ চলছে। তার ফলাফল এখনো পাওয়া যায়নি, কিন্তু যেটুকু শোনা যাচ্ছে তা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাজনক। শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের প্রতি বা কিশোরীদের প্রতি আমাদের সার্বিক অবহেলাই আজ আমাদের এই জায়গায় দাড় করিয়েছে। একদিকে সরকারি পরিকল্পনাগুলি (যেমন, আই সি ডি এস) এর করুণ রূপায়ন, অন্যদিকে সামজে এ নিয়ে আলোচনা না হওয়া— সচেতনতার অভাব, প্রতিবাদ না হওয়া— অবহেলা জনিত আচরণ এই দুই দিক থেকে এই ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়ে এসেছে। এরাজ্যে জঙ্গলমহল বা দার্জিলিং সমস্যা নিয়ে যত আলোচনা হয় শিশু পুষ্টি নিয়ে তার এক শতাংশ হলেও হয়তো রাজ্যের শিশুদের এই হাল হত না।

শিশু ও তার পুষ্টি

পর্যাপ্ত পুষ্টিই হল একটি শিশুর শারীরিক ও মানবিক বিকাশের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শর্ত। জন্মের পরের প্রাথমিক দু' বছরই হল প্রতিটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রধান

ভিত্তি। আর তাই এই সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টি গ্রহণই (নির্দিষ্ট খাদ্যগুণ সম্পন্ন খাবার) পারে তাকে অপুষ্টির থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। বিশ্বের ৪১টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ৫ বছর বয়সের কম শিশুদের অপুষ্টির হার সর্বাধিক লক্ষ করা গেছে ভারতে। অর্থাৎ, এই সূচক অনুযায়ী, অন্য দেশগুলির তুলনায় ভারতের স্থান সর্বনিম্নে। ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ যেমন, বাংলাদেশ, নেপাল, তেমনই সুদূর আফ্রিকার দেশ— নাইজেরিয়া, কেনিয়া, জিম্বাবোয়ে, প্রভৃতি দেশের এই সূচকের হার ভারতের তুলনায় কম। অর্থাৎ, সবকটি দেশেরই অবস্থান ভারতের উপরে।

সারণী ১: বিশ্বের বিশেষ কয়েকটি দেশের ৫ বছরের কম বয়স এমন শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার

ভারত	৪৮%	(২০০৫-০৬)
বাংলাদেশ	৪৬%	(২০০৭)
নেপাল	৪৫%	(২০০৬)
নাইজেরিয়া	২৯%	(২০০৩)
কেনিয়া	২০%	(২০০৩)
জিম্বাবোয়ে	১৬%	(২০০৫-০৬)

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে ৫ বছরের কম বয়স এমন শিশুদের কম ওজন বিচার করলে দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে ঐ সূচকের হার সর্বোচ্চ মধ্যপ্রদেশে (৬০%) এবং সর্বনিম্ন সিকিমে (১৯.৭%)। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান মাঝামাঝি। পশ্চিমবঙ্গে এই হার ৩৮.৭% এবং ভারতের ক্ষেত্রে ৪২.৫%

আবার ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্‌থ সার্ভে-III অনুযায়ী, ভারতের ৫ বছরের কম বয়স এমন শিশুদের শতকরা ৪৮

সারণী ২ : রাজ্য অনুযায়ী শিশুদের পুষ্টির স্তরের পার্থক্য	
রাজ্য	শতাংশের বিচারে ৫ বছরের কম বয়সী অপুষ্ট শিশু
দিল্লী	২৬
রাজস্থান	৩৯.৯
মধ্যপ্রদেশ	৬০
বিহার	৫৫.৯
পশ্চিমবঙ্গ	৩৮.৭
মণিপুর	২২.১
সিকিম	১৯.৭
কেরালা	২২.৯
তামিলনাড়ু	২৯.৮
ভারত	৪২.৫

জন স্টান্টেড, অর্থাৎ এদের উচ্চতা বয়সের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ৪০ শতাংশ শিশু আন্ডার ওয়েট শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ, এই সমস্ত শিশুর ওজন বয়সের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং ২০ শতাংশ শিশু ওয়েস্টেড যাদের ওজন উচ্চতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় অপুষ্টির মাত্রা (সবকটি সূচকই)-র নিরিখে গ্রামাঞ্চলের ৫ বছরের কম বয়স এমন শিশুদের অপুষ্টির হার তুলনামূলক ভাবে শহরের শিশুদের অপুষ্টির হারের থেকে যথেষ্ট বেশি। কারণটা খুব সহজেই অনুমান করা যায়। গ্রামাঞ্চলের শিশুরা যে পুষ্টি পায় তা খুব স্বাভাবিকভাবেই শহরাঞ্চলের শিশুদের প্রাপ্ত পুষ্টির তুলনায় কম হয়। এটি আবার অন্য বেশ কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ফলে, অপুষ্টির মাত্রাও গ্রামাঞ্চলের ৫ বছর এর কম বয়সের শিশুদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়।

সারণী ৩: শহরে ও গ্রামে অপুষ্টির মাত্রা		
অপুষ্টির মাত্রার সূচক	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল
স্টান্টেড (বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম)	৪০	৫১
ওয়েস্টেড (উচ্চতার তুলনায় ওজন কম)	১৭	২১
আন্ডার ওয়েট (বয়সের তুলনায় ওজন কম)	৩৩	৪৬

আবার শিশুদের (৫ বছর এর থেকে কম বয়স এমন) অপুষ্টি যে তার অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গেও সম্পর্কিত তাও প্রমাণিত হয়েছে। শিশুদের বাড়ির অথনৈতিক অবস্থাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা গেছে অর্থনৈতিক অবস্থার যত উন্নতি হয় অপুষ্টি তত কমতে থাকে। অর্থাৎ, উচ্চ আর্থিক ক্ষমতা সম্পন্ন পরিবারের শিশুরা তুলনামূলকভাবে বেশি পুষ্টিকর খাবার পায়/খায়। সেখানে, অপেক্ষাকৃত নিম্ন অর্থনৈতিক অবস্থা এমন

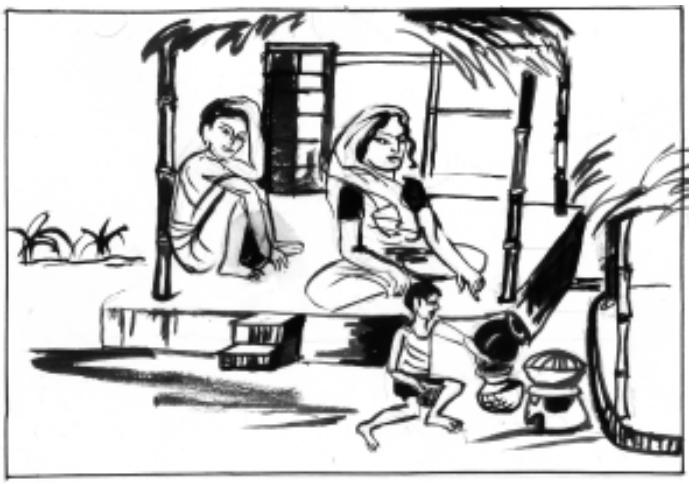

বাড়ির শিশুরা সুষম আহার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। এক্ষেত্রে নিম্ন অর্থনৈতিক অবস্থার

সারণী ৪: পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার স্তর ও অপুষ্টির মাত্রা

পারিবারিক আয়ের বিভিন্ন স্তর	অপুষ্টি শিশুর সংখ্যা		
	স্ট্যান্টেড (বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম) (শতাংশ)	ওয়েস্টেড (উচ্চতার তুলনায় ওজন কম) (শতাংশ)	আন্ডার ওয়েট (বয়সের তুলনায় ওজন কম) (শতাংশ)
সবচেয়ে কম	৬০	২৫	৫৭
দ্বিতীয়	৫৪	২২	৫৯
মধ্যবর্তী	৪৯	১৯	৪১
চতুর্থ	৪১	১৭	৩৪
সর্ব্বোচ্চ	২৫	১৩	২০

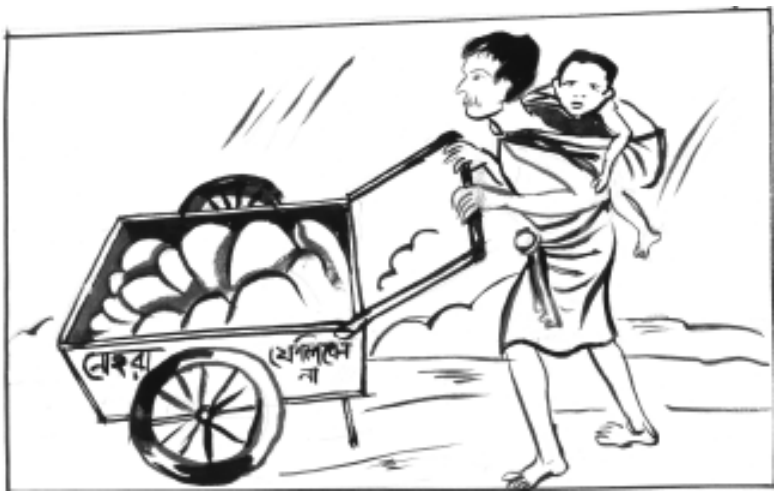

কারণে নিম্ন ক্রয় ক্ষমতাই এর মূল কারণ বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়।

দেখা গেছে যদি দু' টি শিশুর জন্মের সময়ের ফারাক চার বছরের কম হয়ে থাকে তাহলে বর্তমানে জন্মগ্রহণকারী শিশুটির অপুষ্টিতে ভোগার প্রবণতা সর্বাধিক। তবে যদি দু' টি সন্তানের জন্মের মধ্যবর্তী সময় চার বছরের বেশি হয় তবে শিশুর অপুষ্টিতে ভোগার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম হয়।

আবার ৫ বছর বা তার কম বয়স এমন শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যে কোনও শিশুর জন্মের ক্রমের সঙ্গে তার অপুষ্টির যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, কোনও মা-বাবার প্রথম সন্তানের অপুষ্টিতে ভোগার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় সন্তানের সংখ্যার ক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। তাই বলা যায়, পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তানের পুষ্টির মাত্রা কনিষ্ঠের পুষ্টির মাত্রার থেকে বেশ কিছুটা বেশি হয়। এক্ষেত্রে কোনও মহিলার প্রতিবার গর্ভধারণ করার জন্য তাঁর শিশুদের অপুষ্টির মাত্রাও প্রতিবার বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে।

সারণী ৫ : মায়ের দুটি সন্তানের জন্মের মধ্যে সময়ের পার্থক্য ও শিশুদের অপুষ্টির হার

দুটি সন্তান জন্মের সময়ের পার্থক্য	অপুষ্টির হার
২ বছরের কম	৪৮%
২ থেকে ৩ বছর	৪৬%
৪ বছর বা তার বেশি	৪০%

পাঁচবছরের কম বয়স এমন শিশুদের অপুষ্টির সঙ্গে তাদের মায়েদের শিক্ষার স্তরও সম্পর্কিত। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্‌থ সার্ভে-III অনুযায়ী শিশুর অপুষ্টির মাত্রার নির্দেশকারি প্রতিটি সূচকই শিশুর মায়ের শিক্ষার স্তরের উর্দ্ধগামিতার সঙ্গে বিপরীত ভাবে সম্পর্কিত। দেখা গেছে মায়ের শিক্ষা বাড়ার সঙ্গে অপুষ্টির হার পর্যায়ক্রমে কমতে থাকে। অর্থাৎ সবচেয়ে কম শিক্ষিত বা একেবারেই অশিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে অপুষ্টি বেশি হয়ে থাকে। শিশুর অপুষ্টিতে ভোগার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অধিক শিক্ষিত মহিলাদের থেকেও। এক্ষেত্রে মনে করা হয়, মায়ের

সারণী ৬: শিশুর জন্মানুক্রমিতার সাথে তার পুষ্টির সম্পর্ক

জন্মানুক্রম	অপুষ্টিতে শিশুদের ভোগার মাত্রার শতকরা হার
১	৩৬
২-৩	৪১
৪-৫	৫০
৬	৫৭

সারণী ৭: শিশুর অপুষ্টি ও মায়ের শিক্ষা

মায়েদের শিক্ষার স্তর	শিশুর অপুষ্টির হার (শতাংশে)		
	স্টান্টেড (বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম)	ওয়েস্টেড (উচ্চতার তুলনায় ওজন কম)	আন্ডারওয়েট (বয়সের তুলনায় ওজন কম)
অশিক্ষিত	৫৭	২৩	৫২
পাঁচ বছরের কম (সম্পূর্ণ)	৫০	২১	৪৬
পাঁচ-সাত বছর (সম্পূর্ণ)	৪৬	১৯	৩৯
আট-নয় বছর (সম্পূর্ণ)	৪১	১৮	৩৫
দশ-এগারো বছর (সম্পূর্ণ)	৩৩	১৪	২৭
বারো বছর বা তার বেশি (সম্পূর্ণ)	২২	১৩	১৮

শিক্ষা তার জ্ঞানের যেমন পরিপূর্ণতা প্রদান করে তেমনটি তাকে শিশুর পুষ্টির ব্যাপারে আরও সচেতন করে তোলে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অন্যতম কয়েকটি শহরের বস্তি এবং সাধারণ এলাকায় বসবাসকারী (৫ বছর বা তার কম বয়স এমন) শিশুদের পুষ্টির স্থিতি বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেছে যে প্রতি ক্ষেত্রেই শহরের অন্যান্য অংশের তুলনায় বস্তি অঞ্চলের শিশুদের অপুষ্টির পরিমাপের সবকটি সূচকের মাত্রা শহরের গড় অপুষ্টির মাত্রার থেকে বেশি। অপর দিকে বস্তি ছাড়া শহরের অন্যান্য সাধারণ অঞ্চলে এই হার অপেক্ষাকৃত কম। এখান থেকে একটি বিষয় খুব সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে বস্তি অঞ্চলের মানুষের নিম্ন আর্থিক অবস্থার কারণেই

সারণী ৮: শহরের বস্তি ও অন্যান্য জায়গার শিশুদের অপুষ্টির পার্থক্য

শহরের নাম	জায়গা	শিশুর অপুষ্টির মাত্রার সূচক		
		স্টান্টেড (%) (বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম)	ওয়েস্টেড (%) (উচ্চতার তুলনায় ওজন কম)	আন্ডারওয়েট (%) (বয়সের তুলনায় ওজন কম)
দিল্লী	মোট	৪১	১৫	২৭
	১) বস্তি	৫১	১৫	৩৫
	২) সাধারণ জায়গা	৩৮	১৬	২৪
কোলকাতা	মোট	২৮	১৫	২১
	বস্তি	৩৩	১৭	২৭
	সাধারণ অঞ্চল	২৩	১৪	১৬
মুম্বাই	মোট	৪৫	১৬	৩৩
	বস্তি অঞ্চল	৪৮	১৮	৪২
	সাধারণ অঞ্চল	২৭	১৬	২০

তাদের সন্তানদের সুষম পুষ্টিযুক্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ঠিক মতো মেলে না। আর তাই এই সমস্ত বস্তি অঞ্চলের শিশুদের তথা মায়েদের অপুষ্টির হারও অপেক্ষাকৃত বেশি।

শিশুর পুষ্টি ও মায়ের পুষ্টি

শিশুর পুষ্টি অনেকাংশে তার মায়ের পুষ্টির উপর নির্ভর করে। তাই গর্ভবতী অবস্থায় মহিলাদের পুষ্টির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেখা গেছে, অপুষ্টির শিকার এমন মহিলারা অপুষ্ট শিশুর জন্ম দেন। অপর পক্ষে, স্থূলকায় মহিলাদের শিশুদের স্থূলতা জনিত অপুষ্টির প্রবণতা বেশি। আবার অপুষ্টি জনিত কারণে রক্তাল্পতাও দেখা যায় এবং সে ক্ষেত্রে যে রাজ্যে শিশুদের মধ্যে রক্তাল্পতা যত বেশি, সেখানে মায়েদের রক্তাল্পতার হারও তেমন বেশি। ন্যাশানাল ফ্যামিলি হেল্‌থ সার্ভে III অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে শিশু ও মায়েদের রক্তাল্পতার হার বিচার করলেও এমনই চিত্র ফুটে ওঠে।

সারণী ৯: রাজ্য অনুসারে শিশু ও মায়েদের রক্তাল্পতার হার

রাজ্য	মহিলাদের মধ্যে রক্তাল্পতা (%)	শিশুদের মধ্যে রক্তাল্পতা (%)
অসম	৬৯.৫	৬৯.৬
মনিপুর	৩৫.৭	৪১.১
মিজোরাম	৩৮.৬	৪৪.২
সিকিম	৬০.০	৫৯.২
দিল্লী	৪৪.৩	৫৭.০
পঃ বঃ	৬৩.২	৬১.০
বিহার	৬৭.৪	৭৮.০
ঝাড়খন্ড	৬৯.৫	৭০.৩
অন্ধ্রপ্রদেশ	৬২.৯	৭০.৮
ভারত	৫৫.৩	৬৯.৫

শিশুদের ক্ষেত্রে অ্যানিমিয়া প্রাদুর্ভাবের হার ভারতে ৬৯.৫ শতাংশ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫৫.৩ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান মাঝামাঝি জায়গায়। এরাজ্যে শিশু ও মহিলাদের ক্ষেত্রে হার যথাক্রমে ৬১.০ ও ৬৩.২ শতাংশ। শিশুদের ক্ষেত্রে অ্যানিমিয়ার সমস্যা সবথেকে বেশি লক্ষ করা যায় বিহারে (৭৮.০ শতাংশ) এবং সব থেকে কম মণিপুরে (৪১.১ শতাংশ)। মহিলাদের ক্ষেত্রে অ্যানিমিয়ার হার সর্বোচ্চ যথাক্রমে অসম ও (৬৯.৫ শতাংশ) ও ঝাড়খন্ডে (৬৯.৫ শতাংশ) এবং সর্বনিম্ন মণিপুরে (৩৫.৫ শতাংশ)।

মায়ের পুষ্টির সঙ্গে শিশুর পুষ্টি যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সেটা আবার অন্যভাবেও প্রমান করা যায়। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্‌থ সার্ভে-III থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী যে সমস্ত ক্ষেত্রে মায়েদের দেহের ওজন স্বাভাবিকের থেকে কম, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁদের সন্তানদের অপুষ্টির মাত্রার সব কটি সূচকের মানও বেশি। তুলনামূলকভাবে মায়েদের শরীরের ওজন স্বাভাবিকের থেকে বেশি হলে শিশুদের অপুষ্টির মাত্রা কম। এ ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হল যে, মায়েদের দেহের ওজন স্বাভাবিকের থেকে বেশি হলেও সেক্ষেত্রে শিশুদের অপুষ্টি হওয়ার প্রবণতা কিছুটা হলেও থেকে যায়। তবে এক্ষেত্রে এই অপুষ্টতার কারণ আর মায়ের ওজন কম থাকার কারণে শিশুর অপুষ্টির কারণ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা।

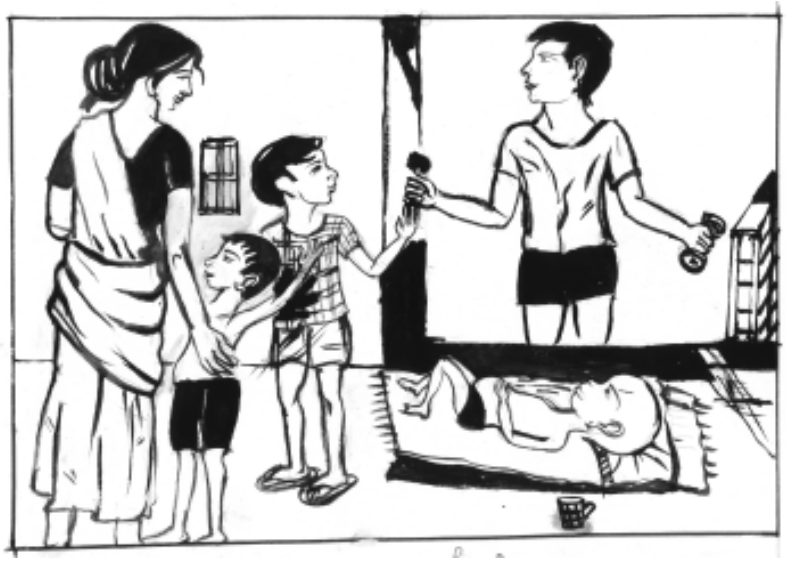

সারণী ১০: মায়ের ওজন ও শিশুর পুষ্টি

অপুষ্টির মাত্রা	মায়ের বেশি ওজন (স্বাভাবিকের থেকে)	মায়ের কম ওজন (স্বাভাবিকের থেকে)
স্টান্টেড শিশু (বয়স অনুযায়ী কম উচ্চতা)	৩১	৫৪
ওয়েস্টেড শিশু (উচ্চতা অনুযায়ী কম ওজন)	৯	২৫
আন্ডার ওয়েট শিশু (বয়স অনুযায়ী কম ওজন)	২০	৫২

মায়ের পুষ্টি

আমরা অগেই জেনেছি মহিলাদের অপুষ্টি যেমন তাঁর নিজের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক, তেমনই তাঁর শিশুর পক্ষেও সেটা বিপজ্জনক। মায়ের পুষ্টির অভাবে শিশুর শরীরে পুষ্টির ঘাটতি তৈরি হলে সময় বিশেষে শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। অপুষ্টির ফলে মহিলাদের ক্ষেত্রে নিম্ন বডি-মাস ইনডেক্স (BMI), রক্তাল্পতা, কম উচ্চতা, প্রসব পরবর্তীকালে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ এর ফলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এমন কি দেখা গেছে, অপুষ্টির ফলে নিম্নহার এবং নিম্নগুণ সম্পন্ন মাতৃদুগ্ধ পানও শিশুর পুষ্টির ঘাটতির কারণ হতে পারে, যার জন্য এমনকি শিশুর জীবনহানির আশঙ্কাও থেকে যায়।

এমন বহু ঘটনার মধ্যে একটি এই রকম— 'সাথরিয়া' জনজাতির এক মহিলা দিলী ডাকা। প্রথম কন্যা সন্তানকে হারান। একটি পুত্রের পর জন্মগ্রহণকারী দুইটি জমজ মেয়েকেও হারান তিনি। শিশুগুলির আকস্মিক মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিল অপুষ্টি। এবং এই অপুষ্টির প্রধান কারণ মা দিলী ডাকার অপুষ্টি। জানা গেছে, জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার কারণে দিলী ডাকার বসবাস ছিল সাধারণ বসতির বাইরে, ফলে তাদের পারিবারিক অবস্থাও ছিল নিম্ন আর তাই সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরবর্তী সময়ে খাবার হিসাবে তার জুটত একটি রুটি ও পেঁয়াজ। যা আদতে তাঁর মত একজন গর্ভবতী মহিলার জন্য মোটেই পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ নয়। ফলে, তাঁর মাতৃদুগ্ধের পরিমাণও ছিল কম, যার জন্য সদ্যোজাত শিশুগুলি পুষ্টির অভাবে ভুগে মারা যায়। শিশুর জন্মের পর প্রথম ৬ মাস যেখানে মাতৃদুগ্ধই শিশুদের একমাত্র আহার, সেখানে এই পরিণতি অবশ্যম্ভাবীই ছিল। আরও মর্মান্তিক হচ্ছে দিলী ডাকার চতুর্থ সন্তানটি জন্মের পর অপুষ্টির দরুন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলা। শিশুটির শরীরে ভিটামিনের চূড়ান্ত অভাব ছিল। এমন ছবি তপশিলী জাতি, জনজাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষদের মধ্যে বেশ লক্ষ্য করা যায়। আবার,

মহিলাদের পুষ্টির বিচার বাসস্থানের নিরিখে করলে একটা ছবি পাওয়া যায়। শহরাঞ্চলের মহিলাদের ক্ষেত্রে অভাবজনিত অপুষ্টির মাত্রা তুলনামূলক-ভাবে গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের অপুষ্টির মাত্রার থেকে কম। কিন্তু স্থূলতা জনিত অপুষ্টির মাত্রা শহরের মহিলাদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের থেকে বেশি। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে যথার্থ পুষ্টির ধারণা আমাদের মধ্যে স্পষ্ট নয় বলেই অপুষ্টিজনিত এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। শহরের মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার বেশি। অর্থের সমস্যাও প্রকট নয়। অথচ সঠিক পুষ্টি জনিত ধারণা স্বচ্ছ না হওয়ার দরুন তাঁরা এবং তাঁদের শিশুরা স্থূলতাজনিত অপুষ্টিতে ভোগেন। সোজা কথায় ভুলভাল খাবার বেশি খেয়ে তাঁরা তাঁদের বিপদ ডেকে আনেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শুধুমাত্র অর্থ বা শিক্ষা দিয়েই পুষ্টির সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। দরকার পুষ্টি জনিত যথার্থ সচেতনতা।

সারণী ১১: বাসস্থান অনুযায়ী মায়ের ওজন এর তারতম্য

	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল
অতিরিক্ত ওজন	২৫%	০৯%
কম ওজন	২৪%	৪০%

১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের মধ্যে অপুষ্টির হারকে জাতিগত বৈষম্যের আলোয় বিচার করলে পাওয়া যায়, তপশীলি জনজাতির মহিলা সর্বাপেক্ষা বেশি অপুষ্টির শিকার হন। আর

মহিলাদের এই অপুষ্টির মাত্রা তপশীলি জাতি, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর ক্ষেত্রে তুলনা মূলকভাবে কম, যদিও জাতিগত বিভিন্নতার কারণে দুটি জাতি বা জনজাতির মহিলাদের অপুষ্টিতার ফারাক বেশ কম।

অন্যদিকে, স্থূলতার কারণে অপুষ্টি জনজাতির মহিলাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম। তপশিলী জাতি, জনজাতি ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির আওতার বাইরের মহিলাদের ক্ষেত্রে স্থূলতাজনিত অপুষ্টি তুলনা- মূলকভাবে বেশি লক্ষ করা যায়।

পারিবারিক আর্থিক স্থিতির সঙ্গে অপুষ্টির শিকার এমন মহিলাদের সংখ্যা বা হার বিচার করলে আবার সেই একই ছবি দেখা যায়, যেখানে পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে অভাব জনিত অপুষ্টতা কমতে থাকে, এবং ঠিক এর উলটো দিকে দৈহিক স্থূলতার কারণে অপুষ্টতার মাত্রা তুলনামূলকভাবে উচ্চতর আর্থিক অবস্থা সম্পন্ন পরিবারের মহিলাদের মধ্যে বেশি চোখে পড়ে। এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই হারও বৃদ্ধি পায়।

পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে বিচার করলে দেখা যায় পরিবারে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করা থেকে ভালো পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার — প্রায় সবক্ষেত্রেই মহিলারা বঞ্চনার শিকার। ফলে মহিলাদের পুষ্টির মাত্রাও পুরুষদের তুলনায় কম হয়। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্‌থ সার্ভে III থেকে জানা যায় শতকরা ২৯ জন মহিলা যেখানে সপ্তাহে অন্তত এক বার মাছ/মাংস খান, সেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার কিছুটা বেশি (০৪ শতাংশ)। আবার অনিয়মিতভাবে মাছ/মাংস খান এমন মহিলা ও পুরুষদের শতকরা অনুপাত হল ৩২:৩৫। সেই সঙ্গে এও দেখা যায়, মাছ/মাংস খান না এমন মহিলাদের সংখ্যাটা পুরুষদের থেকে বেশি। এক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষদের শতকরা হার হল যথাক্রমে ৩৩ ও ২৪।

অথচ দৈনিন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার জন্য পুষ্টির গুরুত্ব অপরিসীম এবং অনস্বীকার্যও বটে। আর তাই মানুষের শরীরের স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ

সুষম আহার গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আজকের দিনে সমাজের একশ্রেণির মানুষ অপুষ্টির শিকার একদিকে তাদের পরিবারিক আর্থিক অবস্থার দরুণ ও অপর দিকে আর এক শ্রেণির মানুষ আর্থিক অবস্থা খারাপ না হওয়া সত্ত্বেও পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা পর্যাপ্ত সঠিক পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খবার পর্যাপ্ত পরিমাণে না নিয়ে অপ্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার বেশি পরিমাণে খাওয়ার জন্য অপুষ্টির শিকার হয়। বর্তমানে দিনে দিনে ফাস্টফুড জাতীয় খাবার গ্রহণের প্রবণতা বাড়ছে, যে খাবারগুলো একেবারেই পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ নয়। ফলে শরীরে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদানের যেমন অভাব ঘাটতি হচ্ছে তেমনই অপ্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণে ঠাসা খাবার নানান অপ্রয়োজনীয় উপাদানের আধিক্য ঘটচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন অসুস্থতা দেখা দিচ্ছে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্যাকেটজাত খাবারা অন্যান্য চটজলদি খাবার খুব জনপ্রিয়। কিন্তু মা-বাবাদের এইসব খাবারের ক্ষতিকারক দিকটা বুঝতে হবে। সুষম খাবারের বদলে এই চটজলদি খাবার শিশুদের মধ্যে নানান ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে; এটা প্রমাণিত। এক্ষেত্রেও যথার্থ সচেতনতার অভাবই এই ধরনের সমস্যার মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সারণী ১২: মানুষের প্রয়োজনীয় ক্যালোরির বয়স ভিত্তিক বিন্যাস

বয়স	শক্তি (ক্যালরি)	
	নির্ধারিত দৈনিক মাত্রা (kcal)	সাধারণভাবে বাস্তবে গ্রহণের মাত্রা (kcal)
১-৩ বছর	১২৪০	৬৯৩
৪-৬ বছর	১৬৯০	১০০৯
৭-৯ বছর	১৯৫০	১২২০
২৮ বছরের বেশি		
বসে কাজের পুরুষ	২৪২৫	২০৬৭
সঙ্গে যুক্ত মহিলা	১৮৭৫	১৮৩৯
১৮ বছরের বেশি		
মাঝারি শ্রমের পুরুষ	২৮৭৫	২৪০৯
কাজে যুক্ত মহিলা	২২২৫	১৯৮৮
গর্ভবতী	২১৭৫	১৯৬৪
দুগ্ধবতী	২৪২৫	২০০৭

সারণী ১৩: প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যে উপস্থিত শক্তির ক্যালরি মান (প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যদ্রব্যে)

খাদ্যদ্রব্য	প্রোটিন	ক্যালসিয়াম	শক্তি (kcl)	ভিটামিন
চাল	৬.৪	৯	৩৪৬	-
গম	১১.৮	৪১	৩৪৫	৬৪
ছোলা / শুকনো মটর	১৯.৭	৭৫	৩৬০	৩৯
বাদাম	২৫.৩	৯০	৩১৫	৩৭
মুসুর ডাল	১৬	১০	৯৭	২৪
ডিম	১৩.৩	১৭৬	২১০	৬০০
দুধ	৩২	১২০	৬৭	১৭০
পালং শাক	২	৭৩	২৬	৫৫৮০
ইলিশ মাছ	২১.৮	১৮০	২৭৩	২৪
মূলোশাক	৩.৮	২৬৫	২৮	৫২৯৬

সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প ও পুষ্টি

শিশু, গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী মহিলাদের পুষ্টির ঘাটতি পূরণ ও অন্যান্য কিছু সাধারণ সুবিধা নিশ্চিতিকরণের জন্য একমাত্র প্রকল্প বর্তমানে সারা দেশে চালু আছে সেটি হল সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প। এই প্রদেশে ৫বছর বয়সের কম বয়সী শিশুদের এই প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে শিশুদের বিদ্যালয় পূর্ববর্তী শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে সম্পূরক পুষ্টির ঘাটতি পুরণ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যেই এই প্রকল্পের সূচনা। সাধারণত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সুযোগ শিশু ও মায়েরা পান। তিন থেকে পাঁচ বছর বয়স এমন শিশুদের রান্না করা খাবার ও বাকিদের জন্য রেশন অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র থেকে সরবরাহ করা হয়।

সারণী: ১৪ অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র থেকে সরবরাহকৃত খাদ্যে যে পরিমাণ শক্তি ও পুষ্টিগুণ থাকার কথা

বিভাগ	শক্তির পরিমাণ (কিলোক্যালরি)
গর্ভবতী/দুগ্ধবতী মহিলা	৬০০
শিশু (১-৫ বছর)	৫০০
অতিরিক্ত অপুষ্ট শিশু	৮০০

আমাদের দেশ গত ৩৬ বছরেও এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। দেখা গেছে, লক্ষ্যমাত্রার দুই তৃতীয়াংশ শিশুকে এখনও এই

প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে শহরাঞ্চলের দিকে এই প্রকল্পের প্রসার তুলনামূলকাভাবে গ্রামাঞ্চলের থেকে বেশ কম। এর অন্যতম কারণ হল মানুষের উদাসীনতা।

আবার, জাতিগত বিন্যাস হিসাব করলে দেখা যায়, দুগ্ধবতী বা গর্ভবতী মহিলারা যারা এই প্রকল্পের সাহায্য নিয়েছেন সেই সংখ্যার মধ্যে জনজাতি গোষ্ঠির মহিলাদের প্রতিনিধিত্বই বেশি। এই হার ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে যথাক্রমে তপশিলী জাতি, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মহিলাদের ক্ষেত্রে। আর, দেখা যায় এই প্রকল্পের সুফল পাওয়া মহিলাদের মধ্যে সব থেকে তলায় আছেন সাধারণ জাতির মহিলারা।

বর্তমানে যদিও এই শিশুবিকাশ প্রকল্পে সরকার কর্তৃক অর্থবরাদ্দ আগের তুলনায় বেড়েছে তাও দেখা যাচ্ছে প্রকল্পটির ব্যাপ্তি বেশ কম। সমস্যা আরও আছে, দেখা যায় সরকারিভাবে শিশু ও মায়েরা বছরে ৩০০ দিনের বরাদ্দ পাবেন। তবে যে প্রশ্নটি থেকে যায়, তা হল— তাহলে বছরের বাকি ৬৫ দিন ঐ সমস্ত শিশু ও মায়েদের পুষ্টির ঘাটতি পূরণ হবে কিভাবে? এ প্রশ্নের উত্তর বোধহয় এখনও কারও জানা নেই। আবার, ৩০০ দিনের বরাদ্দের কথা সরকারি ভাবে বলা থাকলেও দেখা যাচ্ছে আমাদের রাজ্যে গড়ে ২৪২.৪ দিন খাদ্য সরবরাহ করা গেছে। জেলা ভিত্তিক এই সংখ্যা বিচার করলে পাওয়া যায় যে খাদ্য সরবরাহের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ স্থানে মূর্শিদাবাদ (২৬৪ দিন) এবং পুরুলিয়া সর্বনিম্ন স্থানে (২২৪.৪ দিন), অর্থাৎ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের আওতায় (শিশু বিকাশ প্রকল্প) শিশু মায়েদের পুষ্টির ঘাটতি থেকে যাচ্ছে প্রায় এক পঞ্চমাংশ (১/৫)। তবে রাজ্যসরকার কর্তৃক বরাদ্দ বৃদ্ধি যে বরাদ্দে ঘাটতি পুরণে অক্ষম তা আই.সি.এস.আর. এর তৈরি ক্যালোরির হিসাব ও রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মিলিয়ে দেখা গেছে। তথ্যানুযায়ী শিশুদের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ, অপুষ্টদের ক্ষেত্রে ৩৭ শতাংশ, এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের ১৪ শতাংশ কালোরি ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। এই ঘাটতি পূরণে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত উচিত।

মিড্ ডে মিল ব্যবস্থার প্রবর্তনও শিশুদের পুষ্টি ঘাটতি কমাতে সাহায্য করেছে, যদিও ১ থেকে ৫ বছর বয়স এমন শিশুরা এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত নয়। এই প্রকল্পটির ক্ষেত্রেও তুল্যমূল্য বিচারে দেখা গেছে শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলেই প্রকল্পটির ব্যপ্তি বেশি। তবে, আজকের দিনে শিশু তথা ছাত্র ছাত্রীদের ভুলভাল খাওয়ার বদ-অভ্যাস যে ভবিষ্যতে তাদের পুষ্টির ঘাটতির মাত্রা আরো বাড়াবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাই বর্তমানে ছাত্র ছাত্রীদের দৈনন্দির খাবারের পছন্দের তালিকার শীর্ষে থাকে আইসক্রিম, চাউমিন, এগরোল প্রভৃতি, যেগুলির খাদ্যগুণ একেবারেই নেই বললে চলে। দেখা গেছে, সাধারণ শাক-সব্জি, ফলমূল ছাত্রছাত্রী তথা শিশুদের একবোরেই অপছন্দের।

ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয় শিশু-ছাত্র ছাত্রীকেই। তাই আমাদের ভবিষ্যতে প্রজন্মকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের অধিকারী করতে চাইলে সর্বপ্রথম তাদের পুষ্টির দিকে নজর দিতে হবে। এদিক দিয়ে বিচার করলে আই.সি.ডি.এস ও মিড-ডে মিল প্রকল্প সর্বজনীন করে তোলার পক্ষে বড় যুক্তি আছে। এটা শুধু গরিবের জন্যই নয়, সম্পন্নদের জন্যও দরকারি। এ বিষয়ে শিশুদের বাবা-মায়েদের নিজেদের আরো বেশি সচেতন হতে হবে এবং তাঁদের মাধ্যমে শিশুরাও এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। এই সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে শিক্ষক-শিক্ষিকা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, প্রভৃতির একটা বড় ভূমিকা আছে। সেই সঙ্গে সমাজের অন্যান্য অংশকেও একাজে এগিয়ে আসতে হবে। মা ও শিশুর পুষ্টি কেবল মা ও শিশুর জন্যই দরকারি নয়, এটা গোটা জাতির জন্যই অত্যাবশ্যকীয়।